অর্ধ-শতাব্দী আগের একুশে ফেব্রুয়ারী, সেলিনা হোসেন; এবং...

এই বছর আমাদের মহান স্বাধীনতা এবং বিজয়'এর পঞ্চাশ বছরপূর্তি! আমি নিজেকে অতন্ত্য সৌভাগ্যবান মনে করি এই কারনে যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধ দেখার এবং বোঝার বয়স আমার সেই সময় হয়েছিল। ক্লাস ৪-৫ এ পড়া অবস্থায় আমরা সাইন্স ল্যাবরেটরী'র বড় ভাই; স্বপন ভাই, বাবুল ভাই, খালেদ ভাই, জালাল ভাই, বেলায়েত ভাই'দের কথা গিলতাম। আমাদের সাইন্স- ল্যাবের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী স্বপন ভাই আর কট্টর ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বাবুল ভাই' কিভাবে মলোটভ ককটেল বানাতে হয়, তার বর্ননা দিতেন নীচের সিড়ি ঘরে। আমি, দুলাল, রুশো তা নিয়ে আলাপ করতাম। সেই সময় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। রাতে মশাল মিছিল বের হতো এলিফান্ট রোড'এ, আর আমরা দুলাল'দের বিল্ডিং এর ছাদে উঠে মিছিল দেখতাম। সেই সময় মিছিল'এ শ্লোগান ছিল, তোমার, আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা!
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত এক অনন্য চলচিত্র 'হাঙ্গর, নদী গ্রেনেড! যুদ্ধের পাশাপাশি এক মায়ের মুক্তিযুদ্ধের এবং বিশেষত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মমতা, ভালবাসা আর ত্যাগের এক মহান উপাখ্যান! চলচিত্রের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় এক মা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রান বাচানোর জন্য কিভাবে নিজের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন, এবং ছেলের প্রানের বিনিময়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাচান। এই মহান উপন্যাস'এর স্রষ্টা সেলিনা হোসেন থাকতেন মনীশা'র একতলায়। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন, সেলিনা আন্টি। বড়'দের কাছে উনার পরিচয় ছিল, মিসেস খালেক হিসাবে। পরবর্তীতে মুনা, লারা'র মা হিসাবে'ও অনেকে উনাকে চিনতেন।
'বাঙ্গালীর হাসির গল্প' ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রিয় বই। সেই বইয়ের লেখক' পল্লী-কবি জসীমউদ্দিন'কে আমি প্রথমবারের মত দেখি সেলিনা আন্টির বাসায়। তখন উনারা থাকতেন এ-৬' তে। সেলিনা আন্টি ছিলেন আমার দেখা প্রথম, এবং সেই সময় আমাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরী' স্টাফ কোয়াটারের একমাত্র সাহিত্যিক।
'১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বন্ধু রুশো'দের মনীষা'র বাসায় প্রতিদিন সেলিনা আন্টির সাথে দেখা হত। তখন মুনা খুবই ছোট, আর লারা কোলে। পরবর্তীতে 'লারা' এক বিমান দূর্ঘটনা'য় মৃত্যুবরন করে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফখ্রুল এর ছোট ভাই'ও সেই বিমান দূর্ঘটনা'য় একই সাথে মৃত্যুবরন করে। সেলিনা আন্টি মেয়ের উপর লিখেছেন উনার বিখ্যাত বই,'লারা'।
সেই সময় একুশে ফেব্রুয়ারী'র আগের রাতে বা ভোরে শহীদ মিনারে দেওয়ার জন্য ফুল চুরি করা ছিল আমাদের কাছে মহান দায়িত্ব এবং শহীদ'দের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধার নিদর্শন। ১৯৭১ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী'র আগের রাতে রুশো'দের বাসা সায়েন্স ল্যাবরেটরী'র 'মনীষা'র বাগানে শহীদ দিবসের জন্য ফুল-চুরি করতে গিয়ে আন্টি'র কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়লে প্রচন্ড বিব্রত হই। আব্বা-আম্মার কাছে নালিশ করার হুমকি দেওয়ার পরিবর্তে' আমাকে অবাক করে তিনি বলেছিলেন, দাড়াও আমি ফুলের তোড়া বানিয়ে দিচ্ছি'!! এভাবেই তিনি শৈশবে আমাদের মধ্যে দেশের জন্য অনুপ্রেরনা'র সৃষ্টি করেছিলেন।
সেই সেলিনা আন্টি সারা জীবন দেশ, মুক্তিযুদ্ধ আর মানুষের জন্য লিখেছেন আর এই বয়সেও কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শুধু গল্প আর উপন্যাসে দেশপ্রেম তুলে ধরেন নাই; ব্যাক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন দেশপ্রেম আরে অনুপ্রেবনার এক অনন্ত উৎস। সেলিনা হোসেন আন্টি, কথা-সাহিত্যক আর 'হাঙ্গর, নদী, গ্রেনেড' এর মত সাহিত্য আর চলচিত্র'এর গল্প'র স্রষ্টার সাথে দেখা হয়েছিল ৪৮ বছর পর!
আমার বই '১৯৭১ ভেতরে বাইরে সত্যের সন্ধানে' বইটি আন্টি'কে উপহার দিতে গত বছর ফেব্রুয়ারী'তে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে যাই। এত দশক পরেও সেলিনা আন্টিকে বই'টি

উপহার দিতে পেরে খুব ভাল লাগছে। আমার ফুল চুরি এর ধরা খাওয়ার গল্প শুনে তিনি উপভোগ করেছিলেন!
১৯৭২ সালে বাবুল ভাই'এর উদ্যোগে সাইন্স ল্যাবের খেলার মাঠে ইট দিয়ে তৈরী করা হয় শহীদ মিনার (যা বিতর্কের সৃষ্টি করে)। আমিও স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করি সেই প্রকল্পে। এই বার ফুল চুরি করতে যাই, মহুয়া'দের বাসায়। ওদের 'বেড়া দিয়ে ঘেরা' খুব সুন্দর বাগান ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম 'বেড়ার এক জায়গায় ফাঁক আছে। তাই খুব সকালে সেই বাগানে ফুল চুরি করছিলাম, ভাবছিলাম 'গেরস্থ ঘুমাচ্ছে'। হটাত জানালার পাশ থেকে 'ফুল চোর, ফুল চোর' বলে গগন-বিদারী চিৎকার! আমি লিচু চোরের মত 'বেড়া'র ফোকল গলে, যেই না বের হয়েছি, দেখি চাচা (মহুয়ার আব্বা) সামনে দাঁড়িয়ে। আমি যাকে বলে সি ও টী, কট। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া!
সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং আব্বার নাম শোনার পরে চাচা বললেন, "এই বারের মত ছেড়ে দিলাম, প্রতিজ্ঞা কর' আর কোন দিন এই কাজ করবে না"। আমিও প্রথমে কাঠ (আসলে বাশ), এবং পরে চোখ ছুয়ে কিরা কাটলাম; তওবা করেছিলাম কিনা মনে আসছে না, মনে হয় পশ্চিম দিকে তাকিয়ে তওবা'ও করেছিলাম। মৌখিক মুচলেকা দেওয়া এবং মুক্তি লাভের পর' একাত্তুরে শেখা, আয়াতুল কুরছি এবং দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে বাসার দিকে হাঁটা দিলাম, আর দেখলাম যে এই ঘটনার কোন সাক্ষী আছে কিনা। মনে হলো যে, বাঁচা গেল' এই ঘটনার কোন প্রতক্ষ্যদর্শী বা চাক্ষুস সাক্ষী নাই।

ফুল সংগ্রহের পর আমাদের কাজ ছিল, আব্বার ফজর নামাজের পর, এক সাথে খালি পায়ে আজিমপুর পুরানো কবরস্থান হয়ে শহীদ মিনারে যাওয়া, আর ফুল দেওয়া।